সার্বিক সিদ্ধান্ত

পরিশেষে একথাই বলতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলা পুরুলিয়ার ধূসর ঢেউ খেলানো মালভূমি এবং পাহাড় ঘেরা অরণ্য অধ্যুষিত এলাকা বলে পরিচিত হলেও লোকায়ত জীবনের সংস্কৃতিও অত্যন্ত প্রাণবন্ত। ঐতিহ্য পরম্পরা গ্রামীণ সংস্কৃতির আঙিনায় তফসিলি জাতি-উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর (কুড়মি মাহাত, সরাক, নাপিত, তেলি, কামার প্রভৃতি) সম্প্রদায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারাতেও এই সংস্কৃতি লালিত হচ্ছে। সোঁদা মাটির স্পর্শে ভরপুর এই সংস্কৃতি। মাটি আর মানুষ হচ্ছে এই সংস্কৃতির সম্পদ। রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ঝালদা, মানবাজার প্রভৃতি হল এই জেলার শহরগুলি ছাড়াও কিন্তু প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। সুতরাং গ্রামে গ্রামে লোকসংস্কৃতির সমীক্ষা করতে গিয়ে এখানকার লোকায়ত জীবনে অজস্র বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছি। এইসব বৈশিষ্ট্য যা গবেষণা কর্মে তুলে ধরেছি। পশ্চিমবঙ্গের এই জেলার যে বর্ণময় চেহারা বা রূপ নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছি তা এক কথায় বৈচিত্র্যময়। তা হল-

১. লোকায়ত ঐতিহ্যের নিরিখে লোকসংস্কৃতির উদ্ভব। যার ফলে কালের গর্ভে বিশ্বায়নের অভিঘাতে আজও এই সংস্কৃতি উজ্জ্বলতা হারায় নি।

২. লাল কাঁকুরে মাটির সোঁদা গন্ধে আর মহুয়ার মাদকতায় প্রাণবন্ত।

৩. লোকসংস্কৃতির পরিসরে নানা বৈশিষ্ট্য উঠে এসেছে লোকাচার ও লোকবিশ্বাসের জগতে। কোথাও কোথাও তফসিলি সমাজে লক্ষ্য করেছি বিজ্ঞান চিন্তাকে সংস্কার মেনে চলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছে আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে জীবনাচরণের আদিমতা লক্ষ্য করেছি।

৪. জেলার লোকগবেষকদের লেখা গ্রন্থ,পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়ে লোকসংস্কৃতির নানা দিক বিশ্লেষণ রূপায়ণের নানা তথ্য খুঁজে পেয়েছি। তেমনি আমি আমার গবেষণার নতুন দিক উন্মোচিত করার চেষ্টা করেছি। কারণ এখানকার লোকজীবন থেকে উদ্ভুত হয়েছে লোকসংস্কৃতির ধারা । এখানে লোকসমাজের ভূমিকাই বড়। কিন্তু আমি আমার গবেষণার অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছি সমাজ ও সংস্কৃতির বন্ধনে। জেলার বর্ণময় ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ের পর জাতিগুলির সামগ্রিক ঐতিহ্যময় জীবন প্রণালী তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। নৃতাত্ত্বিক পরিচয়,সামাজিক বিন্যাস, লোকাচার, লোকদেবতা –এগুলি আমার গবেষণার মৌলিক কর্ম বলে আমি মনে করি।

৫. তফসিলি হাড়ি,মুচি,ডোম এরা নিজস্ব জাতবৃত্তির পরিসরে নিজেদের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের চেষ্টা করেছেন। এর একটা ইতিহাস বিধৃত করবার চেষ্টা করেছি। লোকায়ত জীবনে এরা আধুনিক প্রযুক্তি ও নান্দনিককে গ্রহণ করে ছৌ,ঝুমুরকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন।

তফসিলি জাতির পারস্পরিক সম্পর্কগত বৈশিষ্ট্য আলাদা হলেও জীবনাচরণে ও পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে যা গবেষণার উল্লেখযোগ্য দিক। তফসিলি জাতির পারস্পরিক ভাব বিনিময় লক্ষ্য করেছি-

১. লোক উৎসব-পার্বণে

২. মেলা প্রাঙ্গণে

লোকউৎসব-পার্বণে, মেলা প্রাঙ্গণে তফসিলি জাতি ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের মানুষ এসে মিলিত হন। মিলন মেলায় ধর্ম সমন্বয়ের এক অভূতপূর্ব চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

এছাড়াও তফসিলি সমাজে লক্ষ্য করেছি বিবাহ অনুষ্ঠানে, মৃত্যু ও পারলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত যারা আসেন তারা তফসিলি ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়। আমন্ত্রণে সাড়া পেয়ে মুসলিম সমাজের মানুষও ছুটে আসেন। এখানে ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে প্রীতির বন্ধন গড়ে ওঠে।

শেষ অধ্যায়ে জেলার লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ করতে গিয়ে ছড়া,প্রবাদ,ধাঁধা,রাতকথা শুনেছি। এদের স্রষ্টা কে বা কারা তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে লোকসমাজ হৃদয়ের প্রাণাবেগে তা ধরে রেখেছে। এইসব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা সমাজের প্রতিটি মানুষের কর্তব্য বলে মনে হয়। কেননা দিনে দিনে শিক্ষার হার বাড়ছে। বিজ্ঞান চেতনার প্রসার বাড়ছে। বিশ্বায়নের প্রভাব গ্রাম জীবনের অভিঘাতে লোকায়ত সংস্কৃতি আজ অবলুপ্তের পথে। মেলা প্রাঙ্গণ, উৎসব-পার্বণে মানুষের উপস্থিতির হার ক্রমশই কমে যাচ্ছে। তবুও মানুষ এখনো লোকসংস্কৃতির জগৎকে ধরে রেখেছে। বংশ পরম্পরায় ঐতিহ্যের নিরিখে এখানকার লোকসমাজের লোকায়ত জীবনে এখনও বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে।

এখানকার তফসিলি জাতিদের ধর্ম,ভাষা,লৌকিক দেব-দেবী ও লোকউৎসব সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। জাতিতে জাতিতে ভেদ থাকলেও সকলের অন্তরাত্মা যে একই প্রকৃতির ছত্রছায়ায় ঐশ্বরিক বন্ধনে একসূত্রে বাঁধা তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। এই উপলব্ধি সকল জাতির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে বলেই সকল জাতি মিলেমিশে পাশাপাশি বসতি গড়ে তুলেছে। দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কাটালেও এরা সকলের মধ্যে প্রকৃতির দেওয়া আনন্দ খুঁজে পেয়েছে ,বাঁচার রসদ পেয়েছে। তাই এরা আজ অবহেলার পাত্র নয়। বর্তমানে সরকারের সহযোগিতায় এরা পেয়েছে শিক্ষার আলো আর উন্নয়নের দিশা। এরাই গড়ে তুলবে নতুন ভারত- এই আমার প্রত্যাশা।